Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের দেবীস্তুতি

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুহেনা আবদুল আউয়াল
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.7
Pages	128-135
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের দেবীস্তুতি

আবু হেনা আবদুল আউয়াল*

কোন কোন ঘটনার অভিঘাত মানুষের জীবনে অকল্পনীয় পরিবর্তন সূচিত করে। আর সে মানুষটি যদি হন কোন কবি বা শিল্পী তা হলে তো আর কথাই থাকে না ; কারণ, কবি বা শিল্পীরা হন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ। কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) শিশুপুত্র অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুলের (১৯২৬-১৯৩০) মৃত্যুর অভিঘাতে তাঁর জীবনের গতি-প্রকৃতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়।

দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ক্রমাগত অন্তর্মুখী হতে থাকেন। বুলবুল ছিলো সপ্রতিভ, শ্রুতিধর ও সুদর্শন। তার প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন স্নেহ। সে বসন্তে আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানোর জন্য এলোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথিসহ ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ করে দিয়ে বুলবুল মৃত্যুবরণ করে। বসন্তে আক্রান্ত পুত্র বুলবুলের মৃত্যু শিয়রে বসে তাঁর অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (১৯৩০) বুলবুলকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্র থেকে বুলবুলের প্রতি তাঁর মনোভাব ও তার মৃত্যু-অভিঘাতে তাঁর মানসিক অবস্থা আঁচ করা যায় সহজেই।

এর বছর দুয়েক পূর্ব থেকে তিনি নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। ১৯২৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও পরের বছর থেকে তাতে তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ তাঁকে সাহিত্যের চেয়ে সঙ্গীতে আগ্রহী করে তোলে। একদিকে সঙ্গীতচর্চা ও অন্যদিকে বুলবুলের মৃত্যুশোক তাঁকে পুরোপুরি ভাবজগতে বা মিস্টিক লোকে নিয়ে যায়। আরও পরে, সম্ভবত ১৯৩৬ সাল থেকে, গৃহযোগী শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের (১৮৮৬-১৯৪০) কাছে তিনি যোগ সাধনার দীক্ষা নেন। এ সম্পর্কে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, '১৯৩৬ সাল থেকে নজরুল মহাকালীর ভক্ত হয়ে ওঠেন ; বরদাচরণ মজুমদারের কাছ থেকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নিয়ে সাধনা শুরু করেন। এ সময় তিনি 'যোগাম্বধি' নামে ব্যায়াম বই কিনে তা দেখে দেখে যোগব্যায়াম করতে লাগলেন। নেশার মতো তাঁকে এ কাজটি পেয়ে বসেছে।' (১৯৭৩ : ২৬৪-৬৬)

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ফেনী সরকারী কলেজ।

তন্ত্র একটি গুহ্যশাস্ত্র। জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা -- এ চারটি হলো তন্ত্রের বিষয়। এ সময় তিনি এ তন্ত্রের সাধনায় আত্মমগ্ন হন। তিনি কোরান, বেদ, চণ্ডী, উপনিষদাদি পড়তে শুরু করেন, বাড়ীতে কালীমূর্তি স্থাপন করে তার জপতপ করতে থাকেন। (আজহারুদ্দীন খান, ১৩৯৭ : ২০২)

গুহ্যতন্ত্র সাধনায় গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হতে হয়। বরদাচরণ মজুমদারের কাছে দীক্ষা নিলেও, তিনি (বরদাচরণ মজুমদার) তাঁকে এ কাজের উপযুক্ত মনে করতেন না। উলেখ্য, সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) ও নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪)-সহ বহু ব্যক্তি তাঁর কাছে তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষা নেন। এ তন্ত্রমন্ত্র সাধনার এক পর্যায়ে, ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে, নজরুল 'দেবীস্তুতি' নামক গীতি আলেখ্যটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে নিতাই ঘটক জানিয়েছেন,

> এই ঘটনাকালের কিছু আগে থেকেই কবি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। সেসময় তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে সাধুসন্তদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁকে এই সময়ে বিভিন্ন প্রকারে যোগ সাধনা করতেও দেখেছি। এই সময় তিনি আমিষ আহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। তার বিধবা শাশুড়ীর সঙ্গে (যিনি তাঁর সংসারেই কর্তৃস্থানীয় হয়েছিলেন) দিনে রাতে মাত্র একবার 'সাত্ত্বিক মতে' আহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে কবির নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ('সঙ্কলকের নিবেদন', 'দেবীস্তুতি' ১৩৭৫ : ঙ)

এক মাতৃস্তুতি গানে তিনি লিখেছেন :

> মাগো আমি তান্ত্রিক নই
> তন্ত্র-মন্ত্র জানিনা
> আমার মন্ত্র যোগ সাধনা
> ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।
>
> (১২ নং গান, 'রাঙা জবা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৩ : ১৪৮)

এ যোগ সাধনার মূল সূত্র হচ্ছে একমাত্র ভগবানের কাছে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করা ; প্রাণে, বোধে, অনুভবে ও সত্তার সকল অংশ দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এতে সিদ্ধিলাভের সর্বোত্তম উপায় হল চারটি শ্রেষ্ঠ কারকশক্তির সমন্বিত ক্রিয়াফল : শাস্ত্র, উৎসাহ, গুরু ও কাল (শ্রীমতি সুধা বসু অনূদিত, ২০০০ : ২০)। নজরুল তাঁর জীবনের ঐ বিশেষ সময়পর্বে এসবের চর্চা-সাধনার মাধ্যমে পরম সত্তা ভগবানের সঙ্গে 'অদ্বৈত নিবিড় মিলনে'র চেষ্টা করেছেন।

নিতাই ঘটক জানিয়েছেন তাঁর 'ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে' নজরুল 'দেবীস্তুতি' রচনা করেন ('সঙ্কলকের নিবেদন', পূর্বোক্ত, ঙ)। বেতারে প্রচারের উদ্দেশ্য সামনে

রেখেই এটি রচিত। রচনার পর পরই ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৮ সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে এটি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। রেডিওতে প্রচারের পূর্বে ১৬ই জানুয়ারি 'বেতার জগৎ'-এর প্রথম প্রচ্ছদে নজরুলের ছবি ছেপে ভেতরে 'আমাদের কথা' বিভাগে (পৃ. ৪৫) দেবীস্তুতির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়। তাতে 'দেবীস্তুতি' সম্পর্কে বলা হয়,

> হিন্দুর মহাদেবী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপের যে মোহনীয় বিকাশ সেই শ্রীশ্রীমহাকালীর প্রকটকালের ভাবসঙ্গীত এই 'দেবীস্তুতি'। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই সঙ্গীতগুলো রচনা করেছেন। শাস্ত্রের উক্তিতে জগন্মাতার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে সেই রূপ অভিনবভাবে জাগ্রত হয়েছে কবির ধ্যানলোকে। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীরা এই দেবীস্তুতির গানগুলি গাইবেন এবং গানগুলি ব্যাখ্যা ও বিশেষণ করবেন স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম। দেবীস্তুতি অনুষ্ঠানের অধিবেশন হবে ২৭শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে। (আসাদুল হক, ১৯৯৯ : ৩৯)

'বেতার জগৎ'-এর পরবর্তী সংখ্যায় (৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) উক্ত অনুষ্ঠানের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় এর রচনা ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতে ছিলেন নিতাই ঘটক। শ্রীরণজিৎ গুহের নেতৃত্বে বাসন্তী যন্ত্রীকুঞ্জ সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এতে কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন যথাক্রমে বিজন সেন, গীতা মিত্র, অনিমা মুখোপাধ্যায়, মলিনা বসু, রত্নমালা সেন, গৌরী সেন, রেবা সেন, বাসন্তী দাশগুপ্ত, সন্ধ্যা সেন, তুষার পাল, উমা মিত্র, মনিকা সেন, কল্পনা হাজরা, অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন ও গৌরী মিত্র। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন মনোরঞ্জন সেন (ঐ, ৪১)।

পরের বছর ২৫শে জুলাই পুনরায় কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'দেবীস্তুতি' প্রচারিত হয়। এবারও প্রচারের পূর্বে ১৬ই জুলাই 'বেতার জগৎ'-এ নজরুলের ছবিসহ 'আমাদের কথা' বিভাগে দেবীস্তুতি ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে লেখা হয়,

> ২৫শে জুলাই মঙ্গলবারে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়েছে। এই 'দেবীস্তুতি'র রচয়িতা বর্তমানে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিরচয়িতা এবং সুরকার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি নজরুলের এই পর্যায়ের গানগুলো কেবলমাত্র কাব্য সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়, প্রত্যেকটি গান যেন শক্তিসাধকের আত্মোপলব্ধি থেকে রচিত। কবি নজরুল ইসলাম স্বয়ং এই অনুষ্ঠানের কথা অংশগুলি আবৃত্তি করবেন। নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভার পরিচয় বাঙালী জাতি বহুদিক থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু এই সঙ্গীতগুলি তাঁর পূর্ব রচনা থেকে স্বতন্ত্র। সেকালের রচনায় ছিল উন্মাদনা, কিন্তু এগুলির সৃষ্টি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ প্রেরণা থেকে। (ঐ, ৪৩)

এবারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ হলেন : রচনা ও বর্ণনায় কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীত পরিচালনায় নিতাই ঘটক ও কালিদাস গাঙ্গুলী, সংগঠনায় সুরেন সেন ও মনোরঞ্জন রায়, সহকারী রণজিৎ গুহ ; সঙ্গীতানুষঙ্গ : সুশীল সরকার, সন্তোষ চন্দ্র, কমল বসু, আরো অনেকে। বিভিন্ন অংশে ছিলেন কল্পনা হাজরা, বিজন বালা ঘোষ দস্তিদার, গীতা মিত্র, মলিনা বসু, রত্নমালা সেন, রোবা সোম, ইলা ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা সেন (ঐ, ৪৪)।

নজরুল ইসলাম 'দেবীস্তুতি' যে বছর লেখেন সে বছরই, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে 'বিজয়া' ও ডিসেম্বর মাসে 'হর-প্রিয়া' নামে দুটি গীতিনাট্যধর্মী রচনাও লেখেন, যেগুলো দেবীস্তুতির ভাবানুষঙ্গী। এর পূর্বে, এ সময়ে ও এর পরে তিনি প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত বা মাতৃস্তুতি সঙ্গীত রচনা করেন। খুব সম্ভব 'বিজয়া' ও 'হরপ্রিয়া'ও সে সময়ে কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয়।

এর বহু পরে, নজরুলের অসুস্থাবস্থায় ১৯৬৮ সালে, নিতাই ঘটকের উদ্যোগে, সঙ্কলনে ও সম্পাদনায় ১৬টি মাতৃস্তুতি গানসহ 'দেবীস্তুতি', 'বিজয়া' ও 'হরপ্রিয়া' একত্রে 'দেবীস্তুতি' নামে প্রকাশিত হয়। (এতে সঙ্কলিত মাতৃস্তুতির ১৬টি গান ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে রচিত বলে সঙ্কলক জানিয়েছেন) 'এইগুলি ['দেবীস্তুতি', 'বিজয়া' ও 'হরপ্রিয়া'] পড়ে পাঠক পাঠিকাগণ কবি-প্রতিভার একটি নতুন দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন' এই প্রত্যাশায় নিতাই ঘটক সেগুলো সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশের প্রয়াস পান। 'পাঠ সহায়ক হবে' বিবেচনা করে তিনি সুগায়ক অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি ভূমিকা লেখান। ঐ ভূমিকায় লেখক দেবীস্তুতি ও বিজয়ার কাহিনীজট উন্মোচনের চেষ্টা করেন। তিনি নজরুলকে 'শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃরূপের নব ভাষ্যকর' বলে অভিহিত করেছেন।

'দেবীস্তুতি'র 'প্রথম সংস্করণ' জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল মহালয়া, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮)। প্রকাশক ছিলেন শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র দাশ। শ্রী হীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীসুরেশ প্রেস, ১৮৬/১, আচার্য প্রফুল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৪ হতে এটি মুদ্রিত হয়। হলদে পটভূমির ওপর কালো রঙে 'দেবীস্তুতি' লেখার ওপরে নীচে দুটি বৃন্তে ফুলের পাপড়ি এবং তার নীচে পাদস্থানে 'নজরুল ইসলাম' লেখা ছিল। সঙ্কলনটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা (৮+) ৬২। তন্মধ্যে শুধু 'দেবীস্তুতি'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭। এর মূল্য লেখা ছিল তিন টাকা মাত্র।

'দেবীস্তুতি'র বিষয়বস্তু আদ্যাশক্তি ও তাঁর বিভিন্ন রূপের পরিচয় এবং সে সঙ্গে স্তুতি বা গুণ সঙ্কীর্তন। নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

> এই আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর নাম হয় ব্রহ্মা, যখন পালন করেন তখন তিনি বিষ্ণু, যখন সংহার করেন তখন তিনি রুদ্র। আবার যখন তিনি নিত্য রাসলীলা করেন তখন তিনি কৃষ্ণ। যখন তিনি কিছুই করেন না তখন তিনি নিরাকার, নির্গুণ ও পরব্রহ্ম।...পৃথিবীতে যখন তুফান, বন্যা, ঝড়, মহামারী, ভূমিকম্প আসে, তখন সকল জাতি সকল মানুষ এক সাথেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার তাঁহার বিগলিত করুণারূপে যখন শীতল বৃষ্টিধারা ঝরে তখন তাহা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ঘরে ঘরে সকল জাতির শিরে শিরে, সকল মানুষের মাঠে ঘাটে বর্ষিত হয়। তাঁর কাছে ভেদ-জ্ঞান নাই। সকলেই যে তাঁহার সৃষ্ট জীব। ঐকান্তিক আগ্রহে, একনিষ্ঠ তপস্যা দিয়া যে তাঁহাকে যে নামে ডাকে তিনি তাহার কাছে সেই নামেই সাড়া দেন। (১৯৩৮ : ৩-৫)

হিন্দু শাস্ত্র মতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হচ্ছেন এ আদ্যাশক্তি। তাঁর শক্তির প্রকাশ জড়ে-জীবে সর্বত্রই। এ শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নামে আর্বিভূত হয়ে অশুভ অসুর শক্তির বিনাশ সাধন করেন এবং সে কারণে মানুষ কর্তৃক বন্দিত হন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিধৃত কাহিনী অনুসারে পুরাকালে সুরথ নামে এক ব্যক্তি কোন এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। ধর্মনিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত ছিলেন বলে তাঁর সুনাম ছিল। নির্বিঘ্নে রাজ্য চালনার শেষভাগে কোথাকার এক ম্লেচ্ছ রাজা এসে হঠাৎ একদিন তাঁর রাজ্য অধিকার করে বসল। এবং তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল।

এরপর সুরথ রাজা মহামুনি মেধসের আশ্রমে ছিলেন। রাজ্য চলে যাবার পর সেখানে অনাচার শুরু হল। ফলে অনাচারের শিকার হয়ে সমাধি নামে এক ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। রাজা রাজ্য ও প্রজার চিন্তায় মগ্ন। শেষে কী করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য রাজা সুরথ ও সমাধি মুনির কাছে গেলেন। মুনি তাঁদেরকে বললেন, 'এসব মহামায়ার খেলা, তাঁকে বোঝ। তাঁকে চিনতে পারলে সব অশান্তি ও বিপদ দূর হয়ে যাবে। তিনি জগতের জীবন। তিনিই সকলকে জন্মাচ্ছেন, তিনিই বিদ্যারূপে জ্ঞান দান করছেন, আবার তিনিই অবিদ্যারূপে মোহ-মায়া ও মমতায় ফেলে জীবকে সংসারভক্ত করছেন। এ মোহজাল অতিক্রম করতে হলে প্রার্থনা দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে হবে। তিনি ও ভগবান একই। ভগবান এই অনন্ত শক্তি মায়ের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন।' – এ সব বলার পর তাঁর অনুরোধক্রমে মেধস তাঁকে মহামায়ার কিছু লীলা কাহিনী শোনান। এসব কাহিনীর মধ্যে ছিল মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী। এসব কাহিনী শোনার পর রাজা সুরথ ও সমাধি মুনিকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। পরে গঙ্গা তীরে কোন এক স্থানে গিয়ে দশ হাজার ভুজার মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রণাম করে নানা উপাচারে দেবী মহামায়ার স্তব শুরু করেন। দীর্ঘ তিন বছর কাল তাঁরা এইভাবে কাটালে হঠাৎ দেবী প্রসন্ন হয়ে বর দেন। তাতে রাজা সুরথ তাঁর রাজ্য ফেরত পেলেন এবং সমাধি পেলেন তত্ত্বজ্ঞান-মহাজ্ঞান। জগতে এ ভাবে প্রথম মাতৃপূজা বা

দেবীস্তুতি প্রবর্তিত হল। এ কাহিনী-সূত্রে নজরুল অন্যত্র তাঁর এক শ্যামাসঙ্গীতে লিখেছেন,

যে নামে ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে,
সেই নাম তুই শিখিয়ে দে মা, ডাকব আমি তেমন করে ॥

(১৭ নং গান, রাঙাজবা, পূর্বোক্ত, ১৫০)

নজরুলের 'দেবীস্তুতি' গ্রন্থে আদ্যাশক্তি ও তাঁর বিভিন্ন রূপের পরিচয় উপর্যুক্ত কাহিনী-সূত্রে রচিত। এ আদ্যাশক্তির প্রধানরূপ তিনটি : মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। নজরুল 'দেবীস্তুতি'র বর্ণনাংশে ও গীতাংশে স্বতন্ত্রভাবে এ ত্রিরূপের কর্ম ও পরিচয় তুলে ধরেছেন। আদ্যাশক্তির প্রথম অবতাররূপে মহাকালীর আবির্ভাব। তিনি অসুর মধুকৈটভকে হত্যা করেন। এ মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে মারতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাহায্য কামনা করেন। বিষ্ণু পাঁচ/দশ হাজার বছর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় অবতাররূপে মহালক্ষ্মী অসুর মহিষাসুরকে হত্যা করেন। মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে। দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু জানান ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষ জাতীয় জীবের হাতে অবধ্য। এরপর সমস্ত তেজ দিয়ে মহালক্ষ্মীকে সৃষ্টি করা হল। তিনি যুদ্ধে মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করেন। তৃতীয় অবতাররূপে মহাসরস্বতী অসুর শুম্ভ-নিশুম্ভকে হত্যা করেন। তারা স্বর্গ অধিকার ও ত্রিলোক পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে। তাদের সঙ্গে চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজ প্রমুখ অসুরও ছিল। বৃহস্পতির পরামর্শে দেবতারা দেবী ভগবতীর প্রার্থনা করতে থাকেন। দেবী কৌশিক ও মহাসরস্বতীরূপে প্রথমে রক্তবীজ ও পরে নিজরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভকে হত্যা করেন। এ ত্রিশক্তির উপাসনার ফল সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন, শ্রী শ্রী মহাকালীর শরণ নিলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মীস্থিতি হয়, শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মীর শরণ নিলে দেবশক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় হয় এবং শ্রী শ্রী মহাশক্তির শরণ নিলে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। (১৯৩৮ : ১৫)

আদ্যাশক্তির এ প্রধান ত্রিরূপের বর্ণনার পর অন্যান্য রূপের পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সতী, উমা, চণ্ডিকা, মহাকালী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, ভ্রামরী। এ ছাড়া, আদ্যাশক্তির দুর্গা, কৌশিকা, চণ্ডিকা, বাসন্তিকা, শাকম্ভরীরূপও প্রসঙ্গ-সূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এবার এসব রূপের পরিচয় তুলে ধরা হল :

সতী : দক্ষের কন্যা। দক্ষ তাঁকে শিবের সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি শ্বশুর হওয়া সত্ত্বেও শিব তাকে উপযুক্ত সম্মান করতেন না। ফলে কন্যার বিয়ের পর তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে শিবকে নিমন্ত্রণ করেননি। কন্যা অযাচিতভাবে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে পিতার মুখে স্বামী শিবের নিন্দা শুনে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। এ সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ শিব দক্ষকে

আক্রমণ করেন ও তাঁর নিজের জটাজাল ছিন্ন করেন। ফলে, দক্ষ নিহত ও যজ্ঞের আগুনে ভস্মীভূত হন এবং পরে পুনরুজ্জীবিত হন।

উমা : পূর্ব জন্মে সতী নামে দক্ষের স্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি হিমালয় রাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পার্বতী। তিনি শিবকে পতিরূপে পাবার জন্যে উদগ্রীব হন, কিন্তু এর জন্যে তাঁকে কঠোর তপস্যা করতে হয়। তাঁর মা তাঁকে 'উ-মা' সম্বোধন ক'রে এ অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বলার পর থেকে তাঁর নাম হয় 'উমা'। বহু বছর তপস্যা করে তিনি শিবের গ্রহণযোগ্য হন।

চণ্ডিকা : দেবী দুর্গার অন্য মূর্তি। চণ্ডী মূর্তিতে তিনি মহিষাসুর বধ করেন। শুম্ভের সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে তিনি 'চণ্ডিকা' নামে খ্যাত হন।

রক্তদন্তিকা : চণ্ডিকা মহাকালীর অন্য নাম। বিপ্রচিত্তি বংশোদ্ভূত দানবদের ভক্ষণের মাধ্যমে সংহার করবেন বলে তাঁর দাঁতগুলো ডালিম ফুলের মত রক্ত বর্ণ হবে। এজন্য স্বর্গে দেবতা ও মর্ত্যে মানবগণ কর্তৃক 'রক্তদন্তিকা' বলে সঙ্কীর্তিত হবেন।

শতাক্ষী : অষ্টাবিংশতিতম যুগের পরে চত্বারিংশতি যুগে ব্রাহ্মণরা বেদ ভুলে যাবে, ফলে যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হবে। এ সময় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হবে। এ সময় দেবতাদের স্তুতিতে আদ্যাশক্তি প্রসন্ন হয়ে শত চোখে অশ্রুপাত করবেন। এ কারণে তাঁর নাম হবে 'শতাক্ষী'।

ভ্রামরী : আদ্যাশক্তির অন্য নাম। 'অরুণ' নামক মহাসুর ত্রিলোকে মানুষের ওপর পীড়ন শুরু করলে দেবতাদের অনুরোধে আদ্যাশক্তি অসংখ্য ষটপদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্তি ধারণ করে তাকে বধ করবেন। এরপর সবাই তাকে 'ভ্রামরী' বলে স্তব করবে।

দুর্গা : দুর্গা হচ্ছেন দুর্গতিনাশিনী দেবী। শাস্ত্রানুসারে দুর্গার 'দ' দৈত্যনাশক, 'উ' কার বিঘ্ননাশক, রেফ রোগনাশক, 'গ' পাপঘ্ন, আ-আর অশত্রুঘ্ন ; অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয় হতে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। এ দুর্গা তাঁর আশ্রিত সাধক ও ভক্ত-সন্তদের স্তবে তুষ্ট হয়ে বর ও অভয় দান করেন এবং সমস্ত অসুর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দুর্গম নামক অসুরকে বধ ক'রে দেবী মহামায়া 'দুর্গা' নামে পরিচিত হবেন।

কৌশিকা : দেবী বিশেষ। মহামায়ার শরীরকোষ হতে বের হন বলে এ নাম। তিনি যুদ্ধে শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাস্ত ও হত্যা করেন।

বাসন্তিকা : দুর্গার অন্য নাম। রাজা সুরথ বসন্তকালে দুর্গার পূজা করেন বলে তাঁর এ নাম।

শাকম্ভরী : উক্ত শতবর্ষের পরেও বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দেবী নিজ দেহ থেকে প্রাণ ধারণের উপযোগী শাক সৃষ্টি করবেন। এজন্য তাঁর নাম হবে 'শাকম্ভরী'।

'দেবীস্তুতি' আখ্যায়িকাটি সমগ্র নজরুল সাহিত্যে এক ভিন্ন সৃষ্টি। বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই এই ভিন্নতা সহজেই শনাক্তেয়। এ গ্রন্থে নজরুলের শিল্পসাফল্যও চূড়াস্পর্শী। ভিন্ন ধর্মের বিষয়ানুষঙ্গ অনুভূতির রসে সিক্ত করে একটি বিশেষ শিল্পাঙ্গিকে উপস্থাপন তাঁর অসাধারণ শিল্পীসত্তার পরিচয়বাহী।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৮
২. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, কলকাতা, ১৯৯৭
৩. আবদুল কাদির, সম্পা., নজরুল রচনাবলী, নতুন বাংলা একাডেমী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩
৪. আসাদুল হক, নজরুল যখন বেতারে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
৫. নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী (উদ্ভব ও বিকাশ), ২য় পর্ব, কলকাতা, ১৯৭৮
৬. নিতাই ঘটক, সম্পা., দেবীস্তুতি, কলকাতা, ১৩৭৫
৭. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল, কলকাতা, ১৯৭৩
৮. শ্যামলী বসু, সংস্কৃত স্তোত্রসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৮৪
৯. শ্রীমতী সুধা বসু ,অনু., যোগ, কলকাতা, ২০০০
১০. মোহিনীমোহন দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্ত, অনু., যোগের পথে আলো, অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৯৯
১১. সুধীরচন্দ্র সরকার, সম্পা., পৌরাণিক অভিধান, কলকাতা, ১৯৮০
১২. সুরেন্দ্রনাথ রায়, মাতৃ-মঙ্গল, কলকাতা, ১৯১৭